আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্কাপিণ্ড ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পর ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে, ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূরা জিনের إِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তফসীরে ইন্‌শাআল্লাহ্ এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে উল্কাপিণ্ড। কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উল্কার সৃষ্টি ? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তাঁরা বলেন ঃ সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। ওপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়---উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়। আরবী ভাষায়ও এর জন্য انقضاض كوكب (তারকা খসে যাওয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভবপর। এমনটা সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশ-তাদের কথাবার্তা শুনতে যায় ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলুসী (র) তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহ্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন ঃ উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাহেলিয়াহ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা অর্থহীন ধারণা। কারও জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ
بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ
نُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

(১৯) আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি। (২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই। (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাৎগামীদেরকে। (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্র করে আনবেন। নিশ্চয় প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) ভারী ভারী পাহাড় স্থাপন করে দিয়েছি এবং তাতে সর্বপ্রকার (প্রয়োজনীয় ফল-ফসল) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি। এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি, (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যেগুলো পানাহার, পরিধান ও বসবাসের সাথে সম্পর্ক রাখে। জীবিকার এসব উপকরণ ও জীবনধারণে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী শুধু তোমাদেরকেই দেইনি; বরং) তাদেরকেও দিয়েছি, যাদেরকে তোমরা রুযী দাও না (অর্থাৎ ঐসব সৃষ্টজীব, যারা বাহ্যতও তোমাদের হাত

থেকে পানাহার ও জীবনধারণের উপকরণ পায় না। 'বাহ্যত' বলার কারণ এই যে, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত পশু যদিও প্রকৃতপক্ষে রুযী ও জীবিকার জরুরী উপকরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পায়, কিন্তু বাহ্যত তাদের পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মানুষের হাতে রয়েছে। এগুলো ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় স্থলজ ও জলজ জীব-জন্তু এবং পশু-পক্ষী ও হিংস্র জানোয়ার এমন যে, এদের জীবিকার কোন মানুষের কর্ম-ইচ্ছার কোন দখল নেই। এগুলো এত অসংখ্য ও অগণিত যে, মানুষ সবগুলোকে চেনেও না এবং গণনাও করতে পারে না।) আর (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যত বস্তু রয়েছে) আমার কাছে সবগুলোর বিরাট ভাণ্ডার (পরিপূর্ণ) রয়েছে এবং আমি (স্বীয় বিশেষ রহস্য অনুযায়ী সেগুলোকে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবতারণ করতে থাকি। আমি বাতাস প্রেরণ করি, যা মেঘমালাকে জলপূর্ণ করে দেয়। অতঃপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দেই। তোমরা তা সঞ্চিত করে রাখতে পারতে না (যে, পরবর্তী বৃষ্টি পর্যন্ত ব্যবহার করবে) এবং আমিই জীবিত করি এবং মৃত্যুদান করি এবং (সবার মৃত্যুর পর) আমিই অবশিষ্ট থাকব। আমিই জানি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমিই জানি তোমাদের পশ্চাৎগামীদেরকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই তাদের সবাইকে (কিয়ামতে) একত্র করবেন। (একথা বলার কারণ এই যে, ওপরে তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে। এতে তওহীদ অবিশ্বাসীদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান (প্রত্যেককে তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন), সুবিজ্ঞ। (কে কি করে, তিনি পুরোপুরি জানেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র রহস্য, জীবিকার প্রয়োজনাদিতে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা ঃ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَّوْزُونٍ -এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে তা পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ-এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে; কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

সব সৃষ্টজীবকে পানি সরবরাহ করার অভিনব ব্যবস্থা ঃ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ থেকে مَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ পর্যন্ত আল্লাহ্র কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশুপক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প থেকে বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃ-পর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথি-বীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত—এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে,

সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোট কথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়োজাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণ্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا—এখানে فرات শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি, যদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

সূরা ওয়াকেআয় বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন?

এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে মেঘমালার সাহায্যে কি চমৎকারভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন! ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীব-জন্তুও ঘরে বসে পানি পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলংঘনীয় প্রাকৃতিক কারণে অবধারিতভাবেই তাদের কাছে পানি পৌঁছে গেছে।

কিন্তু মানুষ ও জীব-জন্তুর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যার চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। তাই তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিনে বৃষ্টিপাত হত। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্তু জীবিকা নির্বাহের অপরাপর প্রয়োজনাদিতে যে কি পরিমাণ ত্রুটি দেখা দিত, তা অনুমান করা অভিজ্ঞজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাস্থ্যের অপরিসীম ক্ষতি হত এবং কাজ-কারবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হত যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন

হত প্রত্যেকের জন্য একটি কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হিফাযত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা।

চিন্তা করুন, এরূপ করা হলে প্রত্যেকেই এতগুলো চৌবাচ্চা অথবা পাত্র কোথা থেকে যোগাড় করত, যে গুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জমা করে রাখা যায়। যদি কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই এই পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহ্‌র কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সর্বত্র সুলভ করার অপর একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা এই যে, আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই গাছপালা, ক্ষেত-খামার মানুষ ও জীব-জন্তুকে সিক্ত করার কাজে লেগে যায়, কিছু পানি উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও নিম্নভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অতঃপর একটি বৃহৎ অংশকে বরফের স্তূপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শৃঙ্গে সঞ্চিত রাখা হয়। সেখানে ধূলাবালি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌঁছতে পারে না। যদি তা পানির মত তরল অবস্থায় থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধূলাবালি অথবা অন্য কোন দূষিত বস্তু সেখানে পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকত। তাতে পশু-পক্ষীদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার আশংকা থাকত। ফলে পানি দূষিত হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গ উঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চুইয়ে-চুইয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সর্বত্র পৌঁছে যায়। যেখানে ঝরনা নেই সেখানে মৃত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনীর ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে।

মোট কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো নিয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথমত পানি সৃষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত। অতঃপর মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর একে মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার সুযোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। অতঃপর এ পানিকে প্রয়োজনানুযায়ী সংরক্ষিত রাখার অটল ব্যবস্থা পঞ্চম নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন আপদবিপদ দেখা দিতে পারে যদ্দরুন মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। কোরআন পাকের فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ আয়াতে এসব নিয়ামতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ---এখানে

সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مُسْتَقْدِمِينَ (অগ্রগামী দল) ও مُسْتَأْخِرِينَ (পশ্চাৎগামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ্ ও ইকরিমা বলেনঃ যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি তারা পশ্চাৎগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক বলেনঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাৎগামী। মুজাহিদ বলেনঃ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাৎগামী। হাসান ও কাতাদাহ্ বলেনঃ ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী, গোনাহ্গাররা পশ্চাৎগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাৎগামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেনঃ এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যদি লোকেরা জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারী যোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহ্র কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফযীলত নিহিত, যেমন কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোন নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাযের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ
خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ
مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ
خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي
إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ
هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

(২৬) আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। (২৮) আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস---সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ্ বললেনঃ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? (৩৩) বলল ঃ আমি এমন নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (৩৪) আল্লাহ্ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত (৩৫) এবং তোমার

প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৩৬) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৯) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ্ বললেন ঃ এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৪৪) এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি পৃথক দল আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মানবকে (অর্থাৎ মানবজাতির আদি পিতা আদমকে) পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ প্রথমে কর্দমকে খুব গাঁজ করেছি ফলে তা থেকে গন্ধ আসতে থাকে। অতঃপর তা শুষ্ক হয়েছে। শুষ্ক হওয়ার কারণে তা থেকে খন খন শব্দ হতে থাকে; যেমন মৃৎপাত্রকে আঙ্গুল দ্বারা টোকা দিলে শব্দ হয়। অতঃপর এই বিশুষ্ক কর্দম দ্বারা আদমের পুতুল তৈরী করেছি। এটা অত্যন্ত ক্ষমতার পরিচায়ক।) এবং জিনকে (অর্থাৎ জিন জাতির আদি পিতাকে) এর আগে (অর্থাৎ আদমের আগে) অগ্নি দ্বারা---(অত্যধিক সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সেটা ছিল তপ্ত বাতাস---) সৃষ্টি করেছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, এ অগ্নিতে ধোঁয়ার মিশ্রণ ছিল না। তাই সেটা বাতাসের মত দৃষ্টিগোচর হত। কেননা, গাঢ় অংশের মিশ্রণের ফলে অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি এক মানবকে (অর্থাৎ তার পুতুলকে) পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করব। অতএব যখন আমি একে (অর্থাৎ এর দেহাবয়বকে) সম্পূর্ণ বানিয়ে নেই এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ ঢেলে দেই, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। অতঃপর (যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বানিয়ে নিলেন, তখন) সব ফেরেশতাই (আদমকে) সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না (অর্থাৎ সিজদা করল না)। আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ইবলীস, তোমার কি ব্যাপার যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? সে বলল ঃ আমি এরূপ নই যে মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ সে অধম ও নিকৃষ্ট উপকরণ দ্বারা তৈরী। আর আমি জ্যোতির্ময় উপকরণ অগ্নি দ্বারা সৃজিত হয়েছি। অতএব জ্যোতির্ময় হয়ে অন্ধকারময়কে কিরূপে সিজদা করি।) আল্লাহ্ বললেন ঃ (আচ্ছা, তা'হলে আসমান

থেকে) বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয় তুমি (এ কাণ্ড করে) বিতাড়িত হয়ে গেছো এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি (আমার) অভিসম্পাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। (যেমন, অন্য আয়াতে আছে, عَلَيْكَ لَعْنَتِي---অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুমি আমার রহমত থেকে দূরে থাকবে---তওবার তওফীক হবে না এবং প্রিয় ও দয়াপ্রাপ্ত হবে না। বলা বাহুল্য যে কিয়ামত পর্যন্ত দয়া পাবে না, তার কিয়ামতে দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এখানে যে পর্যন্ত দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই পর্যন্ত দয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, এতে তো সময় চাওয়ার পূর্বেই সময় দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা উদ্দেশ্য নয় বরং অর্থ এই যে, পার্থিব জীবনে তুমি অভিশপ্ত, যদিও তা কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়।) ইবলীস বলতে লাগল ঃ (আদমের কারণে যখন আমাকে বিতাড়িতই করেছেন) তাহলে আমাকে (মৃত্যুর কবল থেকে) কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দিন (যাতে তার কাছ থেকে এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যথেচ্ছ প্রতিশোধ গ্রহণ করি।) আল্লাহ্ বললেন ঃ (যখন অবসরই চাইলে) তবে (যাও) তোমাকে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবসর দেওয়া হল। সে বলতে লাগল ঃ হে আমার পালনকর্তা, যেহেতু আপনি আমাকে (সৃষ্টিগত বিধান অনুযায়ী) পথভ্রষ্ট করেছেন তাই আমি কসম খাচ্ছি যে, দুনিয়াতে তাদের (অর্থাৎ আদম ও তার সন্তানদের) দৃষ্টিতে গোনাহ্কে সুশোভিত করে দেখাব এবং সবাইকে পথভ্রষ্ট করব আপনার মনোনীত বান্দাদেরকে ছাড়া (অর্থাৎ আপনি তো তাদেরকে আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছেন।) আল্লাহ্ বললেন ঃ (হ্যাঁ) এটা (অর্থাৎ মনোনীত হওয়া যার উপায় হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা) একটা সরল পথ যা আমা পর্যন্ত পৌঁছে। (অর্থাৎ এ পথে চলে আমার নৈকট্যশীল হওয়া যায়।) নিশ্চয় আমার (উল্লিখিত) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না কিন্তু পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমাদের পথে চলে (তারা চলবে)। এবং (যারা তোমার পথে চলবে) তাদের সবার ঠিকানা জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য (অর্থাৎ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য) তাদের পৃথক পৃথক অংশ আছে। (অর্থাৎ কেউ এক দরজা দিয়ে এবং কেউ অন্য দরজা দিয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সিজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ রূহ্ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ---এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আবদুর রউফ মানাভী বলেন ঃ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমান ভিত্তিক ; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকের উক্তি এই যে, রূহ্ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এমতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলিমের মতে রূহ্ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نفخ শব্দের অর্থ ফুঁক মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ্ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেওয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহ্‌কে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রূহ্ ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।---(বয়ানুল-কোরআন)

রূহ্ ও নফ্‌স সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ্ (রহ)-র তথ্যানুসন্ধান ঃ এখানে দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাযী সাহেব বলেন ঃ রূহ্ দুই প্রকার ঃ স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার একটি এককক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ্ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই ঃ কল্‌ব, রূহ্, সির, খফী, আখ্‌ফা---এগুলো আদেশ-জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ্ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়। এই মর্ত্যজাত রূহ্‌কেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মর্ত্যজাত রূহ্‌কে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে; তেমনি-ভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলি-কত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফ্‌সে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফ্‌স স্বর্গজাত রূহ্ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিণ্ডে জীবন ও ঐ সব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফ্‌স স্বর্গজাত রূহ্ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ্ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই نفخ روح তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রূহ্‌কে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِنْ رُّوحِى বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কোরআন পাকে মানব-সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ্ বা নফ্‌স বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কল্‌ব, রূহ্, সির, খফী ও আখ্‌ফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রিফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ المرء مع من احب অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহ্‌র দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গ লাভের কারণেই আল্লাহ্‌র রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সিজদা করুক। আল্লাহ্ বলেনঃ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (তারা সবাই তার প্রতি সিজদায় অবনত হলো)

ফেরেশতাগণ সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছেঃ সূরা আ'রাফে ইবলীসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ---এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলীসকেও সিজদার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ সূরার আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদেরকে বিশেষভাবে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, সিজদার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইবলীসও যেহেতু ফেরেশতাদের

মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই প্রসঙ্গত সে-ও আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা আদমের সম্মানার্থে যখন আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য সৃষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সিজদা করার আদেশ দেওয়াই হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কোরআন পাকে أَبَىٰٓ أَن يَسْجُدَ (সে সিজদা করতে অস্বীকৃত হল) বলার পরিবর্তে

أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ (সে সিজদাকারীদের সাথে শামিল হতে অস্বীকৃত হল)

বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সিজদাকারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্তু ইবলীস যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই যুক্তিগতভাবে তারও সিজদাকারী ফেরেশতাদের সাথে শামিল হওয়া অপরিহার্য ছিল। শামিল না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ ঃ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ---থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদম কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে-কিরাম সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا— (আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে-কিরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে-কিরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা ঃ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ— ইমাম আহ্‌মদ, ইবনে জরীর,

তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নিচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।---(কুরতুবী)।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا
مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ
فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

(৪৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবেঃ এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫০) এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা (অর্থাৎ ঈমানদাররা) উদ্যান ও নির্ঝরিণীবহুল স্থানসমূহে (বসবাস করতে) থাকবে। (যদি গোনাহ্ না থাকে অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে প্রথম থেকেই এবং গোনাহ্ থাকলে শাস্তি ভোগের পর থেকে। তাদেরকে বলা হবেঃ) তোমরা এগুলোতে (অর্থাৎ উদ্যান ও নির্ঝরিণীবহুল স্থানসমূহে) নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (অর্থাৎ বর্তমানেও প্রত্যেক অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে নিরাপত্তা আছে এবং ভবিষ্যতেও কোন অনিষ্টের আশংকা নেই।) এবং (দুনিয়াতে স্বভাবগত তাগিদে) তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা-দ্বেষ ছিল আমি তা (তাদের অন্তর থেকে) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো (ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে) থাকবে, সিংহাসনে সামনা-সামনি বসবে। সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (হে মুহাম্মদ) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং (আরও) এই যে, আমার শাস্তি (-ও) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (যাতে একথা জেনে তাদের মনে ঈমান ও আল্লাহভীতির প্রতি উৎসাহ এবং কুফর ও গোনাহ্‌র প্রতি ভয় জন্মে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম তাদের পানির দু'টি নির্ঝরিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্ঝরিণী থেকে পানি পান করতেই তাদের অন্তর থেকে ঐসব পারস্পরিক শত্রুতা বিধৌত হয়ে যাবে যা কোন সময় দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বভাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা, পারস্পরিক শত্রুতাও এক প্রকার কষ্ট এবং জান্নাত প্রত্যেক কষ্ট থেকেই পবিত্র।

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিন্দু পরিমাণও ঈর্ষা ও শত্রুতা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ ঐ হিংসা ও শত্রুতা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে হয় এবং এর কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। মানবসুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার; এটা এ সাবধান বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে ঐ শত্রুতাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোন শরীয়ত সম্মত কারণের উপর ভিত্তিশীল। আয়াতে এ ধরনের হিংসা ও শত্রুতার কথাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদের মন থেকে সর্ব প্রকার হিংসা ও শত্রুতা দূর করে দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কেই হযরত আলী (রা) বলেনঃ আমি আশা করি, আমি তালহা ও যুবায়ের ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের মনোমালিন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর করে দেওয়া হবে। এতে ঐ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝---এ আয়াত থেকে জান্নাতের দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই; বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা সাদ-এ বলা হয়েছেঃ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ---অর্থাৎ এ হচ্ছে আমাদের রিযিক, যা কোন সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ---অর্থাৎ তাদেরকে কোন সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ

কাউকে কোন বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশংকা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়! কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাচক করে দিয়েছে ঃ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ---অর্থাৎ তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ
إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ
أَبَشَّرْتُمُونِي عَلٰى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا
الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلٰى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا
امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ ۟ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبٰرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا
حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ
مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾
قَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾
قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

فَعِلِينَ ﴿٦١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٦٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
مُشْرِقِينَ ﴿٦٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن
سِجِّيلٍ ﴿٦٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ
مُّقِيمٍ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

(৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল ঃ সালাম। তিনি বললেন ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। (৫৩) তারা বলল ঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলেসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি? এখন কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ? (৫৫) তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? (৫৭) তিনি বললেন, অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ? (৫৮) তারা বলল ঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভুক্ত হবে। (৬১) অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌঁছল। (৬২) তিনি বললেন ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষ রাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। (৬৬) আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হবে। (৬৭) শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌঁছল। (৬৮) লূত বললেন ঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার ইয্‌যত নষ্ট করো না। (৭০) তারা বলল ঃ আমরা কি আপনাকে জগদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। (৭১) তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কংকরের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য

নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন আছে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের (কাহিনীর)-ও সংবাদ দিন। (ঘটনাটি তখন ঘটেছিল) যখন তারা [মেহমানরা---যারা বাস্তবে ফেরেশতা ছিল এবং মানবাকৃতিতে আসার কারণে হযরত ইবরাহীম তাদেরকে মেহ্মান মনে করেন। তাঁর অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর] কাছে আগমন করল। অতঃপর (এসে) তারা আসসালামু আলাইকুম বলল। [ইবরাহীম (আ) তাদেরকে মেহমান মনে করে তৎক্ষণাত আহার্য প্রস্তুত করে আনলেন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ফেরেশতা, তাই তারা আহার করল না। তখন] ইবরাহীম (আ) মনে মনে ভয় পেলেন যে, তারা আহার করে না কেন? তারা মানবাকৃতিতে ফেরেশতা ছিল বলে তিনি তাদেরকে মানবই মনে করলেন এবং আহার না করায় সন্দেহ করলেন যে তারা শত্রু না হয়ে এবং) বলতে লাগলেন ঃ আমরা আপনাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বলল ঃ আপনি ভয় করবেন না। কেননা, আমরা (ফেরেশতা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছি এবং) আপনাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। সে অত্যন্ত জ্ঞানী হবে। [অর্থাৎ নবী হবে। কেননা, মানব জাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'পুত্র সন্তান্ বলে হযরত ইসহাক (আ) কে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে হযরত ইসহাকের সাথে ইয়াকুবের সুসংবাদও বর্ণিত রয়েছে।] ইবরাহীম (আ) বলতে লাগলেন ঃ আপনারা কি এমতাবস্থায় (পুত্রের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি? অতএব (এমতাবস্থায় আমাকে) কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? (উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাপারটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিস্ময়কর। এ অর্থ নয় যে, কুদরতের বাইরে।) তারা (ফেরেশতাগণ) বলল ঃ আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি (অর্থাৎ সন্তানের জন্মগ্রহণ নিশ্চিতই হবে)। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (অর্থাৎ নিজের বার্ধক্যের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। কারণ, প্রচলিত কার্য-কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নৈরাশ্যের চিহ্ন প্রবল হতে থাকে।) ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট লোকদের ছাড়া? (অর্থাৎ আমি নবী হয়ে পথভ্রষ্টদের বিশেষণে কিরূপে বিশেষিত হতে পারি? ব্যাপারটি যে বিচিত্র, আমার এ বক্তব্যের শুধু তাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং আমি এ বিষয়ে আশাতীত বিশ্বাসী। এরপর নবুয়তের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি জানতে পারলেন যে, ফেরেশতাদের আগমনের উদ্দেশ্য আরও কোন গুরুতর ব্যাপার হবে। তাই) বলতে লাগলেন ঃ (যখন ইঙ্গিত দ্বারা আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য রয়েছে, তখন বলুন) এখন আপনাদের সামনে কি গুরুদায়িত্ব আছে হে ফেরেশতাগণ! ফেরেশতাগণ বলল ঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি (তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য) প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ লূতের সম্প্রদায়) কিন্তু লূত (আ)-এর পরিবার-পরিজন ছাড়া। আমরা তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে রাখব

(অর্থাৎ তাদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি বলে দেব যে, অপরাধীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও) তার (অর্থাৎ লূতের) স্ত্রীকে ছাড়া। তার সম্পর্কে আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি যে, সে অবশ্যই অপরাধী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যাবে (এবং তাদের সাথে আযাবে পতিত হবে)। অতঃপর যখন ফেরেশতারা লূত (আ)-এর পরিবারের কাছে আগমন করল, (তখন যেহেতু তারা মানবাকৃতিতে ছিল, তাই লূত) বলতে লাগলেন ঃ (মনে হয়) আপনারা অপরিচিত লোক (দেখুন, শহরবাসীরা আপনাদের সাথে কি ব্যবহার করে! কারণ, তারা অপরিচিতদেরকে উত্ত্যক্ত করে থাকে।) তারা বলল ঃ না (আমরা মানুষ নই) ; বরং আমরা (ফেরেশতা) আপনার কাছে ঐ বস্তু (অর্থাৎ ঐ আযাব) নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করত আর আমরা আপনার কাছে অকাট্য বিষয় (অর্থাৎ আযাব) নিয়ে এসেছি এবং আমরা (এ সংবাদ প্রদানে) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। অতএব আপনি রাত্রির কোন অংশে পরিবারের সকলকে নিয়ে (এখান থেকে) চলে যান এবং আপনি সবার পেছনে চলুন (যাতে কেউ থেকে না যায় অথবা ফিরে না যায় এবং আপনার ভয়ে কেউ পিছন ফিরে না তাকায়। কারণ পিছন ফিরে তাকানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।) এবং আপনাদের মধ্যে থেকেও কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায় (অর্থাৎ সবাই দ্রুত প্রস্থান করবে) এবং যেখানে যাওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হন, সেখানে যাবেন। (তফসীর দুররে-মনসূরে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, তাদেরকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমি (এই ফেরেশতাদের মাধ্যমে) লূত (আ) এর কাছে নির্দেশ পাঠাই যে, ভোর হওয়া মাত্রই তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। ফেরেশতাদের এই কথাবার্তা ঐ ঘটনার পরে হয়েছে, যা পরে বর্ণিত হচ্ছে। কিন্তু অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য যাতে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে জানা হয়ে যায়। ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল অবাধ্যদের আযাব ও অনুগতদের মুক্তি ও সাফল্য ফুটিয়ে তোলা। পরবর্তী ঘটনা এই) এবং শহরবাসীরা (লূতের গৃহে সুদর্শন কয়েকজন কিশোরের আগমনের সংবাদ শুনে) আনন্দ উল্লাস করতে করতে (মন্দ নিয়ত ও কু-ইচ্ছা সহকারে লূতের গৃহে) পৌঁছল। লূত [(আ) এখন পর্যন্ত তাদেরকে মানব সন্তান ও মেহ-মানই মনে করছিলেন। তিনি শহরবাসীদের কু-মতলব টের পেয়ে] বললেন ঃ তারা আমার মেহমান। (তাদেরকে উত্ত্যক্ত করে) আমাকে (সাধারণের মধ্যে) লাঞ্ছিত করো না। (কেননা, মেহমানকে অপমান করলে মেজবানের অপমান হয়। যদি এই বিদেশীদের প্রতি তোমাদের করুণা নাও হয়, তবে কমপক্ষে আমার কথা চিন্তা কর। আমি তোমাদের এ জনপদেরই অধিবাসী। এছাড়া তোমরা যে মতলব নিয়ে এসেছো, তা আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও গযবের কারণ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে (মেহমানদের দৃষ্টিতে) হেয় করো না। (কারণ মেহমানরা মনে করবে যে, নিজের জনপদের লোকদের মধ্যেও তার কোন মানমর্যাদা নেই।) তারা বলতে লাগল ঃ (এ অপমান আমাদের পক্ষ থেকে নয়। আপনি নিজেই তা উপার্জন করেছেন যে, তাদেরকে মেহমান করেছেন।) আমরা কি আপনাকে সারা দুনিয়ার মানুষকে মেহমান করা থেকে (বার বার) নিষেধ করিনি? (আপনি তাদেরকে মেহমান না করলে এ অপমানের মুখ দেখতে হতো না।) লূত (আ) বললেন ঃ (আচ্ছা বল তো) এই ন্যক্কারজনক কাণ্ড করার কি প্রয়োজন, যে কারণে আমার

পক্ষে কাউকে মেহমান করারও অনুমতি দেওয়া হয় না? স্বভাবগত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আমার এই (বউ) কন্যারা (যারা তোমাদের গৃহে আছে) বিদ্যমান রয়েছে। যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, (তবে ভদ্রোচিত পন্থায় নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মতলব পূর্ণ কর। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।) আপনার প্রাণের কসম তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। অতএব সূর্যোদয় হতে হতে ভীষণ শব্দ তাদেরকে চেপে ধরল। (এ হচ্ছে مشرقين এর তরজমা। এর আগে مصبحين শব্দ বলা হয়েছে, যার অর্থ 'ভোর হতে হতে'। উভয় অর্থের সমন্বয় এভাবে সম্ভবপর যে, ভোর থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত শেষ হয়েছে।) অতঃপর (এই ভীষণ শব্দের পর) আমি এই জনপদে (যমীন উল্টিয়ে তার) উপরিভাগকে নিচে (এবং নিচের ভাগকে উপরে) করে দিলাম এবং তাদের উপর কংকর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলাম। এ ঘটনায় চক্ষুষ্মানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (যেমন প্রথমত মন্দ কাজের পরিণাম অবশেষে মন্দ হয়। কিছু দিনের অবকাশ পেলে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী ও অক্ষয় সুখ এবং ইপ্সিত একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌র কুদরতকে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের নিরিখে বিচার করে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন। তিনি বাহ্যিক কারণের বিপরীতেও যা ইচ্ছা করতে পারেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ সম্মান ঃ لَعَمْرُكَ — রূহুল মা'আনীতে অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ-এর মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম খেয়েছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবু নয়ীম ও ইবনে মরদুওয়াইহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেন নি। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোন পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া ঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন কিছুর কসম খাওয়া কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা, কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হতে পারেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহ্‌র কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও।---(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেন ঃ খবরদার, আল্লাহ্ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে।

---(কুরতুবী-মায়েদা)

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোন বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার কালামে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোন সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

যেসব বস্তির উপর আযাব এসেছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ এতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ---অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট

নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে 'মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এ সব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ --অর্থাৎ এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মু'মিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا
لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾
وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

(৭৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যূষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বনের অধিবাসী ও হিজরের অধিবাসীদের কাহিনী ঃ এবং বনের অধিবাসীরা [অর্থাৎ শোয়াইব (আ)-এর উম্মতও] বড় যালিম ছিল। অতএব আমি তাদের কাছ থেকে (ও) প্রতিশোধ নিয়েছি (এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি)। উভয় (সম্প্রদায়ের) জনপদ প্রকাশ্য সড়কের উপর (অবস্থিত) রয়েছে। (সিরিয়া যাওয়ার পড়ে তা দৃষ্টিগোচর হয়।) এবং হিজরের অধিবাসীরা (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে। [কারণ, সালেহ্ (আ)-কে তারা মিথ্যা বলেছে আর যেহেতু সব পয়গম্বরের ধর্ম এক, কাজেই তারা যেন সব পয়গম্বরকেই মিথ্যা বলে।] আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী দিয়েছি [যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব এবং সালেহ্ (আ)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হত। উদাহরণত তওহীদের প্রমাণাদি এবং সালেহ্ (আ)-এর মু'যিজা তথা উষ্ট্রী।] অতঃপর তারা এগুলো (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পর্বত খোদাই করে তাতে গৃহ নির্মাণ করত, যাতে (এগুলোতে বিপদাপদ থেকে) শান্তিতে বসবাস করতে পারে। অতঃপর তাদেরকে প্রত্যূষে (প্রত্যূষের শুরুতে কিংবা সূর্যোদয়ের পর) বিকট শব্দ এসে পাকড়াও করল। অতঃপর তাদের (পার্থিব) নৈপুণ্য তাদের কোন কাজে লাগল না (মজবুত গৃহের মধ্যেই আযাব দ্বারা ধরাশায়ী হয়ে গেল এবং তাদের গৃহ এ বিপদ থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। তাদের বরং এরূপ বিপদ আসবে বলে কল্পনাই ছিল না। থাকলেও বা কি করতে পারত !)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ايكة ---শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙ্গল। কেউ কেউ বলেন ঃ মাদইয়ানের সন্নিকটে একটি বন ছিল। এজন্য মাদইয়ানবাসীদেরই উপাধি হচ্ছে **ايكة**। কেউ কেউ বলেন ঃ আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদইয়ান দুটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর শোয়াইব (আ) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

তফসীর রূহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত মরফু হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ان مدين و اصحاب الايكة امتان بعث الله تعالى اليهما شعيبا والله اعلم

'হিজ্‌র' হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকাকে বলা হয়। এখানে সামুদ গোত্রের বসতি ছিল।

সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মক্কার কাফিরদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতা বর্ণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সান্ত্বনার বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন সূরার উপসংহারে উপরোক্ত শত্রুতা ও বিরোধিতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্ত্বনার বিস্তারিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ

অবশিষ্ট তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তাদের শত্রু তার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা এক দিন এর মীমাংসা হবে। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন, যার আগমন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলছি যে,] আমি নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তু-সমূহকে উপকারিতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি, (বরং এই উপকারার্থে সৃষ্টি করেছি যে, এগুলোকে দেখে মানুষ বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব, একত্ব ও মহত্ত্ব সপ্রমাণ করবে এবং তাঁর বিধি-বিধান পালন করবে। পক্ষান্তরে এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যারা এরূপ করবে না, তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।) এবং (দুনিয়াতে সম্পূর্ণ শাস্তি হয় না। কাজেই অন্য কোথাও হওয়া উচিত। এর জন্য কিয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং) অবশ্যই কিয়া-মত আগমন করবে। (সেখানে সবাইকে ভোগানো হবে। অতএব আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না ; বরং) উত্তম পন্থায় (তাদের অনাচার) মার্জনা করুন। (মার্জনার উদ্দেশ্য এই যে, এ চিন্তায় পড়বেন না এবং এ ব্যাপারে ভাববেন না। উত্তম পন্থা এই যে, অভি-যোগও করবেন না। কেননা) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (যেহেতু) মহান স্রষ্টা, (এ থেকে প্রমাণিত হয় যে) তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী (ও। সবার অবস্থা তিনি জানেন---আপনার সবরের এবং তাদের অনাচার উভয়টিই। আর ওদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।)

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾ كَمَاۤ
اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ
لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا
تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

(৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি, তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্য স্বীয় বাহু নত করুন। (৮৯) আর বলুনঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। (৯০) যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (৯১) যারা কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নেবে। (৯৭) আমি জানি যে, আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (৯৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (৯৯) এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আপনি তাদের ব্যবহার দেখবেন না। কারণ, তা দুঃখের কারণ হয়। আমার ব্যবহার আপনার সাথে দেখুন যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কিরূপ কৃপা ও অনুকম্পা হয়েছে। সেমতে) আমি আপনাকে (একটি বিরাট নিয়ামত অর্থাৎ) সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা (নামাযে) বার বার আবৃত্তি করা হয় এবং (তা মহান বিষয়বস্তু সম্বলিত হওয়ার কারণে এ দেওয়াকে এরূপ বলা যেতে পারে যে,) মহান কোরআন দিয়েছি। (এখানে সূরা ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। একটি মহান সূরা হওয়ার কারণে এর নাম উম্মুল কোরআনও অর্থাৎ কোরআনের মূল। সুতরাং এই নিয়ামত ও নিয়ামতদাতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, যাতে আপনার অন্তর প্রফুল্ল ও প্রশান্ত হয়। তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং) আপনি চক্ষু তুলেও ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না (না আফসোসের দৃষ্টিতে এবং না অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) যা আমি বিভিন্ন প্রকার কাফিরদেরকে (যেমন ইহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজারী ও মুশরিকদেরকে) ভোগ করার জন্য দিয়ে রেখেছি (এবং অতিশীঘ্র তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে) এবং তাদের (কুফুরী অবস্থার) কারণে (মোটেই) চিন্তা করবেন না। (অসন্তুষ্টির

দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র দুশমন বিধায় 'বুগ্‌য ফিল্লাহ্' বশত রাগান্বিত হওয়া যে, এরূপ নিয়ামত তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এর জওয়াবের প্রতি متعنا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা কোন বিরাট ধনসম্পদ নয় যে, তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এটা তো ধ্বংসশীল সম্পদ, অতি দ্রুত হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আফসোসের দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, আফসোস, এসব বস্তু তাদের ঈমানের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। এগুলো না থাকলে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। لَا تَحْزَنْ-এ এর উত্তর রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, শত্রুতা এদের স্বভাবধর্ম। এদের কাছ থেকে কোন আশাই করা যায় না। আশার বিপরীত হলে চিন্তা করা হয়। যখন আশাই নেই, তখন চিন্তা অনর্থক। আপনার পক্ষ থেকে লোভ-লালসার দৃষ্টিতে দেখার তো সম্ভাবনা নেই। মোটকথা, আপনি কোন দিক দিয়েই এ কাফিরদের চিন্তা-ভাবনায় পড়বেন না) এবং মুসলমানদের সাথে সদয় ব্যবহার করুন। (অর্থাৎ কল্যাণ চিন্তা ও দয়ার জন্য মুসলমানরা যথেষ্ট। এতে তাদের উপকারও রয়েছে) এবং (কাফিরদের জন্য কল্যাণ চিন্তা করে যেহেতু কোন ফল পাওয়া যাবে না, তাই তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। তবে প্রচার কাজ আপনার মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন এবং এতটুকু) বলে দিন ঃ আমি (তোমাদের আল্লাহ্‌র আযাবের) সুস্পষ্ট ভীতিপ্রদর্শক। (এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একথা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি যে, আমার পয়গম্বর যে আযাবের ভয় দেখান, আমি কোন সময় তোমাদের উপর তা অবশ্যই নাযিল করব) যেমন আমি (এই আযাব) তাদের ওপর (বিভিন্ন সময়ে) নাযিল করেছি, যারা (আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান কে) ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছিল অর্থাৎ ঐশীগ্রন্থের বিভিন্ন অংশ স্থির করেছিল (তন্মধ্যে যে অংশ মর্জিমাফিক হত তা মেনে নিত এবং যে অংশ মর্জির খিলাফ হত, তা অস্বীকার করত। এখানে পূর্ববর্তী ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন আযাব অবতরণ —যেমন আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শূকরে পরিণত করা, জেল, হত্যা ইত্যাদি সুবিদিত ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, আযাব নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। পূর্বেও নাযিল হয়েছে। তোমাদের উপরেও নাযিল হয়ে গেলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে—দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তীরা পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে যেমন আযাবের যোগ্য হয়েছিল, তেমনি বর্তমান লোকেরাও আযাবের যোগ্য হয়ে গেছে।) অতএব [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার পালনকর্তার (অর্থাৎ আমার নিজের) কসম, আমি সবাই (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী)-কে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব (অতঃপর প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি দেব।) মোটকথা, আপনাকে যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে বিষয় পৌঁছানোর) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার করে শুনিয়ে দিন এবং (যদি তারা না মানে, তবে) মুশরিকদের (এ অবাধ্যতার মোটেই) পরওয়া করবেন না (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে لَا تَحْزَنْ এবং স্বাভাবিকভাবে ভীত হবেন না যে, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক।

কেননা) এরা যারা (আপনার ও আল্লাহ্‌র দুশমন; অতএব আপনার সাথে) বিদ্রূপ করে (এবং) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্য শরীক করে, তাদের (অনিষ্ট ও পীড়ন) থেকে আপনার জন্য (অর্থাৎ আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য) আমিই যথেষ্ট। অতএব তারা অতিসত্বর জানতে পারবে (যে, বিদ্রূপ ও শিরকের কি পরিণাম হয়। মোটকথা, আমি যখন যথেষ্ট তখন ভয় কিসের?) এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা যেসব (কুফুরী ও বিদ্রূপের) কথাবার্তা বলে, তাতে আপনার মন ছোট হয়ে যায়। (এটা স্বাভাবিক) অতএব (এর প্রতিকার এই যে,) আপনি পালনকর্তার তসবীহ্ ও প্রশংসা পাঠ করতে থাকুন, নামায আদায়কারীদের মধ্যে থাকুন এবং আপন পালনকর্তার ইবাদতে লেগে থাকুন, যে পর্যন্ত (এ অবস্থার মধ্যেই) আপনার মৃত্যু না এসে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকুন। কেননা আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতে পরকালের সওয়াব তো পাওয়াই যায়, এর ফলে দুনিয়ার কষ্ট, চিন্তা এবং বিপদাপদও লাঘব হয়ে যায়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতিহাকে 'মহান কোরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উক্তি সম্পর্কে। তফসীর কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, ঈমান কোন বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না। বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে; যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্‌র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে।—(কুরতুবী)

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ —এ

আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম গোপনে গোপনে ইবাদত ও তিলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন দুইজনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফিরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশংকা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তিলাওয়াত, ইবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ—বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি ঃ আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ-জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার ঃ

আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

সূরা নাহ্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَتَىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ

أَنْ أَنْذِرُوْٓا أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ ②

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্য তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। (২) তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এ সূরার নাম সূরা নাহ্‌ল। এরূপ নামকরণের হেতু এই যে, এ সূরায় প্রকৃতির আশ্চর্যজনক কারিগরি বর্ণনা প্রসঙ্গে নাহ্‌ল অর্থাৎ মধু-মক্ষিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর অপর নাম সূরা নিআমও।—(কুরতুবী) نِعَم (নিআম) শব্দটি নিয়ামতের বহুবচন। কারণ এ সূরায় বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান নিয়ামত-সমূহ বর্ণিত হয়েছে।]

আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ (অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় নিকটে) এসে গেছে। অতএব তোমরা একে (অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে) ত্বরিত কামনা করো না। (বরং তওহীদ অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র স্বরূপ শোন যে) তিনি লোকদের শিরক থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তিনি ফেরেশতাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের জাত তথা জিবরাঈলকে) ওহী অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, (অর্থাৎ পয়গম্বরের প্রতি) নাযিল করেন

(এবং নির্দেশ এই) যে, লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, করলে শাস্তি হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরাকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে কিয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

'আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূল (সা)-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখে নেবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।
—(বাহ্রে মুহীত)

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহ্র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরী ও শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র।—(বাহ্রে-মুহীত)

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ একথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিও যথেষ্ট।

আয়াতে روح শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য তফসীরবিদের মতে হিদায়েত বোঝানো হয়েছে।—(বাহ্র) এ আয়াতে তওহীদের

ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তি-গতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٣ خَلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝٤ وَالْاَنْعَامَ
خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٥ وَلَكُمْ فِيْهَا
جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝٦ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى
بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٧
وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨

(৩) যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক উপকার হয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক। (৬) এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না।

শব্দার্থ ঃ خَصِيْمٌ শব্দটি خصومة থেকে উদ্ভূত। অর্থ ঝগড়াটে। انعام শব্দটি نَعَمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ উট, ছাগল, গরু, ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু—(মুফরাদাত-রাগিব)

دِفْءٌ এর অর্থ উত্তাপ ও উত্তাপ লাভ করার বস্তু। অর্থাৎ পশম, যদ্দ্বারা গরম

বস্ত্র তৈরী করা হয়। تُرِيحُونَ শব্দটি رواح থেকে تَسْرَحُونَ শব্দটি سراح থেকে উদ্ভূত। চতুষ্পদ জন্তুর সকাল বেলায় চারণ ক্ষেত্রে গমনকে سراح এবং বিকাল বেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকে رواح বলা হয়। شق الا نفس -এর অর্থ প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ্ তা'আলা) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে রহস্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ওদের শিরক থেকে পবিত্র। তিনি মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে প্রকাশ্যভাবে (আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে) তর্ক করতে লাগল। (অর্থাৎ কিছু মানুষ এমনও হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত আর মানুষের পক্ষ থেকে অকৃতজ্ঞতা।) এবং তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের শীতেরও উপকরণ আছে। (জন্তুদের পশম ও চামড়া দ্বারা মানুষের পরিধেয় পোশাক এবং কাপড় তৈরী হয়।) এবং আরও অনেক উপকারিতা আছে (দুধ দোহন, সওয়ারী করা, বোঝা পরিবহন ইত্যাদি।) এবং এগুলোর মধ্য থেকে (যেগুলো খাওয়ার যোগ্য, সেগুলোকে) ভক্ষণও কর। এগুলো তোমাদের শোভাও, যখন বিকাল বেলায় (চারণ ভূমি থেকে গৃহে) আন এবং যখন সকাল বেলায় (গৃহ থেকে চারণ ভূমিতে) ছেড়ে দাও। এগুলো তোমাদের বোঝাও (বহন করে,) এমন শহরে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ালু (তোমাদের সুখের জন্য তিনি কত কিছু সৃষ্টি করেছেন)। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এগুলোয় সওয়ার হও এবং শোভার জন্যও। তিনি এমন এমন বস্তু (তোমাদের যানবাহন ইত্যাদির জন্য) সৃষ্টি করেন, যেগুলো তোমাদের জানাও নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে সৃষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলী দ্বারা তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টবস্তু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে নিয়োজিত করেছেন। মানবের সূচনা যে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ---অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا -

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ---অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

দুই. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ---অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু যবেহ্ করে খোরাকও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। দুধ, দৈ, মাখন, ঘি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্য বলা হয়েছেঃ وَمَنَافِعُ অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐ সব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর আরও একটি উপকার আরববাসীদের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের সামগ্রী; বিশেষত চতুষ্পদ জন্তু যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা সকালে গোশালা থেকে চারণক্ষেত্রে গমন করে। কারণ, তখন চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মালিকদের বিশেষ শান-শওকত ও জাঁকজমক ফুটে উঠে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্র দূর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

أَنْعَامَ ---অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐ সব জন্তুর কথা প্রসঙ্গত উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। এদের দুধ ও গোশ্‌তের সাথে মানুষের কোন উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছেঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ——অর্থাৎ আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও---বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শান-শওকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ ঃ সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐ সব নবাবিষ্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি ; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে বিভিন্ন কলকব্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতিপ্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্বোল্লিখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خلق বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে يخلق বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন।

ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে সেগুলোর নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তখনকার দিনে যদি রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি শব্দ উল্লেখও করতেন, তবে তাতে সম্বোধিতদের মস্তিষ্কের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোন লাভ

হত না। কেননা তখন এমন জিনিসের কল্পনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল না। উপরোক্ত যানবাহন বোঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহৃত হত না। ফলে এগুলোর কোন অর্থই বোঝা যেত না।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের মুখে শুনেছি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুভী (র) বলতেন ঃ কোরআন পাকে রেলের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ীর ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্কৃতই হয়নি। তাই তিনি শুধু রেলের কথাই বলতেন।

মাস'আলা ঃ কোরআন পাক প্রথমে انعام অর্থাৎ উট, গরু-ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে ঃ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ---এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে ; কিন্তু গোশ্‌ত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। একারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেন নি কিন্তু মাকরূহ বলেছেন।

---(আহ্‌কামুল কোরআন—জাসসাস)

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহংকার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না ; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একথাই থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা---এটা হারাম।

---(বয়ানুল কোরআন)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩

(৯) সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (পূর্বাপর প্রমাণাদি দ্বারা ধর্মের যে) সরল পথ প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ করে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং কিছু (যেগুলো ধর্মের বিপরীত) বক্র পথও আছে (যে, এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। অতএব কেউ কেউ সরল পথে চলে এবং কেউ কেউ বক্র পথে।) এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (মনযিলে) মকসুদে পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। (কিন্তু তিনি তাকেই পৌঁছান, যে সরল পথ অন্বেষণ করে وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ----তাই প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং সত্য অন্বেষণ করা তোমাদের কর্তব্য, যাতে তোমরা মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি 'মধ্যবর্তী বাক্য' হিসাবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব ওয়াদার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিভাত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথ সোজা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবে। এ কারণেই আল্লাহ্র অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।

কিন্তু এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। তারা এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করে না; বরং পথভ্রষ্টতার আবর্তে ঘোরাফেরা করে।

এরপর বলা হয়েছে: যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু রহস্য ও যৌক্তিকতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় চলুক। সরল পথ আল্লাহ্ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা বেছে নিতে পারে।

هُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ ۝ يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَ

الْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑪
وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ
بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑫ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ
فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ⑬
وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑭ وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ
بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑮ وَعَلٰمٰتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ
يَهْتَدُوْنَ ⑯

(১০) তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। (১১) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৩) তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। (১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমরা পান কর এবং যদ্দ্বারা বৃক্ষ (উৎপন্ন) হয়, যার মধ্যে তোমরা (গৃহপালিত জন্তুদেরকে) চরাও (এবং) এই পনি দ্বারা তোমাদের (উপকারের) জন্য ফসল যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও প্রত্যেক ফল (মাটি থেকে) উৎপাদন করেন। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে) চিন্তাশীলদের জন্য (তওহীদের) প্রমাণ (বিদ্যমান) আছে এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (উপকারের) জন্য রাত্র, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) তারকারাজি (ও) তাঁর নির্দেশে (কুদরতের) অনুবর্তী। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও) বুদ্ধি-মানদের জন্য (তওহীদের) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে এবং (এমনিভাবে) ঐসব বস্তুকেও (কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন, যেগুলোকে তোমাদের (উপকারার্থে) বিভিন্ন প্রকারে (অর্থাৎ জাতে, শ্রেণীতে ও রকমে) সৃষ্টি করেছেন (সব জন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ একক ও মিশ্রিত বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও) সমঝদারদের জন্য (তওহীদের) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে। এবং তিনি (আল্লাহ্) এমন যে, তিনি সমুদ্রকে (-ও কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন, যাতে এ থেকে তাজা তাজা গোশত (অর্থাৎ মাছ শিকার করে) খাও এবং (যাতে) এ থেকে (মোতির) অলংকার বের কর, যা তোমরা (নারী-পুরুষ সবাই) পরিধান কর এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি, সমুদ্রের আরও একটি উপকার এই যে) তুমি নৌকাসমূহকে (ছোট কিংবা বড় জাহাজ হোক) এতে (অর্থাৎ সমুদ্রে) পানি চিরে চলে যেতে দেখ এবং (এ ছাড়া সমুদ্রকে এজন্য কুদরতের অনুবর্তী করেছেন) যাতে তোমরা (এতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সফর কর এবং এর মাধ্যমে) আল্লাহ্র দেওয়া রুযী অন্বেষণ কর এবং যাতে (এসব উপকার দেখে তাঁর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে তা (অর্থাৎ পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত (ও টলটলায়মান) না হয় এবং তিনি (ছোট ছোট) নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে (এসব পথের সাহায্যে) মন্‌যিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার এবং (পথের পরিচয়ের জন্য) বহু চিহ্ন রেখেছেন (যেমন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা রাস্তা চেনা যায়। নতুবা ভূপৃষ্ঠ যদি একইরূপ সমতল হত তবে পথ চিনা কিছুতেই সম্ভবপর হত না।) এবং তারকারাজি দ্বারাও মানুষ রাস্তার পরিচয় লাভ করে। (এটা বর্ণনাসাপেক্ষ ও অজানা নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَجَرٌ — مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجَرٌ বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এরপরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে।

ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক تُسِيمُونَ শব্দটি اسامة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ----এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তা-শীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ—অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বুঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও বুদ্ধি আছে, সে বুঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তো কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ—অর্থাৎ এতে তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এ দিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন।

রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا---নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশত লাভ করে।

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا---এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ---এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার।

ডুবুরীরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান অলংকার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐ রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্র-গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলংকার তৈরী করে গলায় অথবা অন্যান্য পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলংকার মহিলারা পরিধান করে থাকে ; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُونَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলংকার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজসজ্জা করাটা প্রকৃত-পক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলংকার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ---এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْك শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِر শব্দটি مَاخِرٌ এর বহুবচন। مَخْر-এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ — رَوَاسِي শব্দটি رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيدَ শব্দটি مَيْد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেন নি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থির-ভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক---উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন---যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ——ওপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনযিলে মকসূদে পৌঁছার জন্য ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে ঃ وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ——অর্থাৎ পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑰ وَإِن تَعُدُّوا

نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا
يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۗءٍ ۚ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا
يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

(১৭) যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। (২১) তারা মৃত—প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে, জানে না। (২২) তোমাদের ইলাহ্ একক ইলাহ্। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি একক তখন) যিনি সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্) তিনি কি তার সমতুল্য হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করতে পারে না? (যে তোমরা উভয়কে উপাস্য মনে করতে থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'আলাকে অপমান করা হয়। কেননা, এভাবে তাঁকে মূর্তি-বিগ্রহের সমতুল্য করে দেওয়া হয়।) অতঃপর তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? (আল্লাহ্ তা'আলা উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, তাতেই নিয়ামত শেষ নয়; বরং তা এত অজস্র যে) যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে (কখনও) গণনা করতে পারবে না। (কিন্তু মুশরিকরা শোকর ও কদর করে না। এটা এমন গুরুতর অপরাধ ছিল যে, ক্ষমা করলেও ক্ষমা হতো না এবং এ অবস্থা বিদ্যমান

থাকলে পরবর্তীকালে এসব নিয়ামত দেওয়া যেত না। কিন্তু) বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কেউ শিরক থেকে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং না করলেও জীবদ্দশায় সব নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায় না।) এবং (হ্যাঁ, নিয়ামত চালু থাকার কারণে কারও এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, কখনও শাস্তি হবে না ; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য---সব অবস্থাই জানেন। (সুতরাং তদনুযায়ী শাস্তি দেবেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যে স্রষ্টা ও নিয়ামত দাতা---এ বিষয়ের বর্ণনা।) এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, তারা কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা স্বয়ং সৃজিত (উপরে সামগ্রিক নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, যে স্রষ্টা নয় এবং যে স্রষ্টা এ দু'সত্তা সমান হতে পারে না। অতএব এরা কিরূপে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? এবং) তারা (মিথ্যা উপাস্যরা) মৃত, [নিষ্প্রাণ---যেমন মূর্তি চিরকাল তা প্রাণহীন থাকে, না হয় বর্তমানে যারা মরে গেছে তাদের মতন, না হয় যারা ভবিষ্যতে মৃত হবে যেমন জিন ও ঈসা (আ) প্রমুখ তাদের মতন---তারা] জীবিত নয়! (অতএব স্রষ্টা হবে কিরূপে?) এবং তাদের (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যদের এতটুকুও) খবর নেই যে, (কিয়ামতে) মৃতরা কখন উত্থিত হবে (কেউ কেউ তো জানই রাখে না এবং কেউ কেউ নির্দিষ্ট করে জানেও না। অথচ উপাস্যের সর্বব্যাপী জ্ঞান থাকা আবশ্যক ; বিশেষত কিয়ামতের। কেননা, এতে ইবাদত করা না করার প্রতিদান হবে। অতএব উপাস্যের জন্য এর জ্ঞান থাকা খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং জ্ঞানে আল্লাহ্‌র সমতুল্য কিরূপে হবে? এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে) তোমাদের সত্য উপাস্য একই উপাস্য। অতএব (এ সত্য উদ্‌ঘাটনের পরও) যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না। (এবং এ কারণেই তারা ভীত হয়ে তওহীদ কবূল করে না ; জানা গেল যে,) তাদের অন্তর (-ই এমন অযোগ্য যে, যুক্তিযুক্ত কথা) অস্বীকার করছে-এবং (জানা গেল যে) তারা সত্য গ্রহণে অহংকার করছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সত্যি কথা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা জানেন (এবং এটাও) নিশ্চিত যে, তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সুতরাং তাদের অহংকার যখন জানা আছে তখন তাদেরকেও অপছন্দ করবেন এবং শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং জগত সৃষ্টির কথা বিস্তারিত উল্লেখ করার পর এসব নিয়ামত বিস্তারিত বর্ণনা করার কারণ অর্থাৎ তওহীদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এককভাবে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং বৃক্ষলতা ও এর ফল-ফুল সৃষ্টি করেছেন, তখন এ পবিত্র সত্তা, যিনি এগুলোর স্রষ্টা তিনি কি মূর্তি-বিগ্রহের সমতুল্য হয়ে যাবেন, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? অতএব তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ
مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ
فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ
فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

(২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলেঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (২৫) ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞাত হেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না। (২৭) অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেনঃ আমার অংশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলবেঃ নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফিরদের জন্য, (২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব

জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে বলা হয় (অর্থাৎ কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জানার জন্য কিংবা ওয়াকিফহাল ব্যক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ) তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন ? [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন সম্পর্কে যা বলেন সেটা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ---এ কথা কি সত্য ?] তখন তারা বলে ঃ (আরে সেটা পালনকর্তা কর্তৃক অবতীর্ণ কোথায়, সেটা তো) ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে (বর্ণিত হয়ে) চলে আসছে। (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পূর্ব থেকে তওহীদ, নবুয়ত ও পরকালের দাবী করে আসছে। তাদের কাছ থেকেই সে-ও বর্ণনা করতে শুরু করেছে। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বাণী নয়।) এর ফল (অর্থাৎ এরূপ বলার ফল) হবে এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজেদের গোনাহ্‌র পূর্ণ বোঝা এবং যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করছে, তাদের গোনাহেরও কিছু বোঝা বহন করতে হবে। ('পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী' বলাই বিপথগামী করার অর্থ। কেননা, এতে অন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কাউকে বিপথগামী করে---বিপথগামিতার কারণ হওয়ার দরুন সেও সমানভাবে গোনাহ্‌গার হবে। গোনাহ্‌র এই কারণজনিত অংশকে 'কিছু পাপভার' বলা হয়েছে। নিজের গোনাহ্ পুরোপুরি বহন করার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।) খুব মনে রেখ, যে বোঝা তারা বহন করছে, তা মন্দ বোঝা। (অন্যদেরকে এ ধরনের কথা বলে বিপথগামী করার যে কৌশল তারা বের করেছে, তা সত্যের মুকাবিলায় কার্যকরী হবে না, বরং এর অভিশাপ ও শাস্তি তাদের ঘাড়েই চাপবে। সেমতে) যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা (পয়গম্বরগণের মুকাবিলা ও বিরোধিতায়) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (চক্রান্তের) তৈরী গৃহ সমূলে ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন। অতঃপর (তারা এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে যেন) উপর থেকে তাদের মাথায় (ঐ গৃহের) ছাদ ধসে পড়েছে (অর্থাৎ ছাদ ধসে পড়ার কারণে যেমন সবাই চাপা পড়ে যায়, এমনিভাবে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।) এবং (ব্যর্থতা ছাড়াও) তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এমনভাবে এসেছে যে, তাদের ধারণাও ছিল না। (কেননা, তারা চক্রান্তে সফল হওয়ার আশায় ছিল। আশাতীতভাবে তাদের উপর ব্যর্থতা ছাড়াও আযাব এমনভাবে এসে গেছে যে, তাদের মস্তিষ্কে অনেক দূর পর্যন্তও এ ধারণা ছিল না। পূর্ববর্তী কাফিরদের উপর আযাব আসা সুবিদিত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা।) অতঃপর কিয়ামতের দিন (তাদের অবস্থা হবে এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং (একটি লাঞ্ছনা হবে এই যে, তাদেরকে) বলবেন ঃ (তোমরা যে) আমার অংশীদার, (ঠাওরে রেখেছিলে) যাদের সম্পর্কে তোমরা (পয়গম্বর ও মু'মিনদের সাথে) জগড়া-বিবাদ করতে, (তারা এখন) কোথায় ? (এ অবস্থা দেখে সত্যের) জ্ঞান প্রাপ্তরা বলবে ঃ আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আযাব কাফিরদের উপর বর্তাবে, যাদের প্রাণ ফেরেশতারা

কুফরী অবস্থায় কবজ করেছিল। (অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাফির ছিল। কাফিরদের লাঞ্ছনা খোলাখুলি ও সর্বসমক্ষে হবে, একথা বোঝানোর জন্য সম্ভবত জ্ঞানীদের উক্তি মাঝখানে বর্ণনা করা হয়েছে।) অতঃপর কাফিররা (শরীকদের জওয়াবে) সন্ধির প্রস্তাব রাখবে এবং বলবে যে, শিরক নিকৃষ্টতর মন্দ কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের কি সাধ্য যে, তা করি! আমরা তো কোন খারাপ কাজ (যাতে আল্লাহ্র সামান্যও বিরুদ্ধাচরণ হয়) করতাম না। (একি সন্ধির বিষয়বস্তু বলার কারণ এই যে, শিরক যা একটি নিশ্চিত বিরুদ্ধাচরণ, দুনিয়াতে তারা খুব জোরেশোরে এর স্বীকারোক্তি করত। যেমন, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا শিরকের স্বীকারোক্তি মানেই বিরুদ্ধাচরণের স্বীকারোক্তি, বিশেষত পয়গম্বরগণের সাথে তারা প্রকাশ্য বিরোধিতার দাবীদার ছিল। কিয়ামতে এই শিরক অস্বীকার করে বিরোধিতা অস্বীকার করবে। তাই একে সন্ধি বলা হয়েছে। তাদের এই অস্বীকার এমন, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তি খণ্ডন করে বলবেন ঃ) হ্যাঁ (বাস্তবিকই তোমরা বিরুদ্ধাচরণের কাজ করেছ) নিশ্চয়ই আল্লোহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। অতএব জাহান্নামের দরজায় (অর্থাৎ দরজা দিয়ে জাহান্নামে) প্রবেশ কর (এবং) তাতে চিরকাল বাস কর। অতএব (সত্য থেকে) অহংকার (বিরোধিতা ও মুকাবিলা)-কারীদের আবাস কতই না মন্দ! (এ হচ্ছে পরকালীন আযাবের বর্ণনা। অতএব আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, তোমরা পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষতি, ইহকাল ও পরকালের আযাবের অবস্থা শুনেছ। এমনিভাবে সত্যধর্মের মুকাবিলায় তোমরা যে চক্রান্ত করছ এবং মানুষকে বিপথগামী করছ, তোমাদের পরিণাম তাই হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি এবং বিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর একক হওয়ার কথা বর্ণনা করে মুশরিকদের নিজেদের বিপথগামিতা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অপরকে বিপথগামী করা ও তার শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। এর পূর্বে কোরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নটি এখানে মুশরিকদেরকে করা হয়েছে এবং তাদেরই মূর্খতাসুলভ উত্তর এখানে উল্লেখ করে তজ্জন্য শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। পাঁচ আয়াত পরে এ প্রশ্নটিই ঈমানদার পরহিযগারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং তাদের উত্তর ও তজ্জন্য পুরস্কারের ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে।

কোরআন পাক এ কথা প্রকাশ করেনি যে, প্রশ্নকারী কে ছিল। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কাফিরদেরকে প্রশ্নকারী ঠাওরিয়েছেন এবং কেউ মু'মিনদেরকে। কেউ এক প্রশ্ন মুশরিকদের এবং অপর প্রশ্ন মু'মিনদের সাব্যস্ত

করেছেন। কিন্তু কোরআন পাক একে অস্পষ্ট রেখে ইঙ্গিত করেছে যে, এ আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? জওয়াব ও তার ফলাফল দেখা দরকার। কোরআন স্বয়ং তা বর্ণনা করে দিয়েছে।

মুশরিকদের পক্ষ থেকে জওয়াবের সারমর্ম এই যে, তারা একথাই স্বীকার করেনি যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং তারা কোরআনকে পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকাহিনী সাব্যস্ত করেছে। কোরআন পাক এজন্য তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়েছে যে, জালিমরা কোরআনকে কিস্‌সা-কাহিনী সাব্যস্ত করে অপরকেও বিপথগামী করে। তাদেরকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের গোনাহ্‌র শাস্তি তো তাদের ওপর পড়বেই, অধিকন্তু যাদেরকে তারা বিপথগামী করেছে, তাদের কিছু শাস্তিও তাদের উপর বর্তাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ গোনাহ্‌র যে বোঝা তারা আপন পিঠে বহন করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ বোঝা।

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا
فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِيْنَ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ
تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ط كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(৩০) পরহিযগারদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে ঃ মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহিযগারদের গৃহ কি চমৎকার? (৩১) সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে! এর পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তা'ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ্‌ পরহিযগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র

থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলেঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমারা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফিররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ পৌঁছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই উল্টে তাদের ওপর পড়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে (যখন কোরআন সম্পর্কে) বলা হয়ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি বস্তু নাযিল করেছেন? তারা বলেঃ খুবই উত্তম (ও বরকতের বস্তু) নাযিল করেছেন। যারা সৎকাজ করেছে (উপরোক্ত উক্তি ও যাবতীয় সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত) তাদের জন্য (এ দুনিয়াতেও) মঙ্গল রয়েছে (এ মঙ্গল হচ্ছে সওয়াবের ওয়াদা ও সুসংবাদ) এবং পরজগৎ তো (সেখানে এ ওয়াদা বাস্তবায়নের কারণে) অধিক উত্তম (ও আনন্দদায়ক)। নিশ্চয়ই সেটা শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের উত্তম গৃহ। (সে গৃহ হলো) চিরকাল বসবাসের উদ্যান, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। এসব উদ্যানের (বৃক্ষ ও দালান-কোঠার) পাদদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদের মনে যা চাইবে, সেখানে তারা তা পাবে। (যাদের উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরই বা কি বৈশিষ্ট্য বরং) এ ধরনের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলা সব শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীকে দেবেন, যাদের রূহ ফেরেশতারা এমতাবস্থায় কবজ করেন যে, তারা (শিরক থেকে) পবিত্র (ও স্বচ্ছ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওহীদের উপর কায়েম থাকে এবং) তারা (ফেরেশতারা) বলতে থাকেঃ আসসালামু আলাইকুম। তোমরা (রূহ্ কবজের পর) জান্নাতে চলে যেয়ো নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। তারা (যে কুফর, হঠকারিতা ও মূর্খতাকে আঁকড়ে রয়েছে এবং সত্যের প্রমাণাদি দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করছে না, মনে হয় যে, তারা শুধু) এ বিষয়ের অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতা এসে যাক কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে যাক। (অর্থাৎ তারা কি মৃত্যুর সময় কিংবা কিয়ামতের দিন বিশ্বাস স্থাপন করবে? যখন ঈমান কবুল হবে না, যদিও সত্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে তখন সব কাফির তওবা করবে। তারা যেমন কুফরকে আঁকড়ে রয়েছে) তেমনি তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও করেছিল (কুফরকে আঁকড়ে ধরেছিল) এবং (আঁকড়ে ধরার কারণে শক্তি পেয়েছিল। অতএব) আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল। (অর্থাৎ জেনে শুনে শাস্তির কাজ করত।) অবশেষে তাদের কুকর্মের শাস্তি তারা পেয়েছে এবং যে আযাবের (খবর পাওয়ার) প্রতি তারা হাসি-ঠাট্টা করত, তাদেরকেই তাই (অর্থাৎ আযাব) এসে ঘিরে ফেলেছে। (তাই তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপই হবে।)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ
وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا
فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ
مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي
الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ اِنْ تَحْرِصْ
عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝
وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ
الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ۝
اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ ع

(৩৫) মুশরিকরা বলল ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়ত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফিরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন

কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুশরিকরা বলেঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা (সন্তুষ্টি হিসাবে) চাইতেন (যে, আমরা অন্যের ইবাদত না করি, যা আমাদের তরিকার মূলনীতি এবং কোন কোন বস্তু হারাম না করি, যা আমাদের তরিকার শাখাগত নীতি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বর্তমান মূলনীতি ও শাখাগত নীতি অপছন্দ করতেন) তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর ইবাদত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপদাদারাও করত না এবং তাঁর (আদেশ) ছাড়া আমরা কোন বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম না। [এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তরিকা পছন্দ করেন। নতুবা আমাদেরকে কেন এরূপ করতে দিতেন? হে মুহাম্মদ (সা) আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, এই অনর্থক তর্ক নতুন ব্যাপার নয়; বরং] যেসব (কাফির) তাদের পূর্বে ছিল, তারাও এরূপ কাণ্ড করেছিল (অর্থাৎ পয়গম্বরদের সাথে অনর্থক তর্ক করেছিল!) অতএব পয়গম্বরদের (তাতে কি ক্ষতি হয়েছে এবং যে পথের দিকে তাঁরা ডাকেন তারই বা কি অনিষ্ট হয়েছে। তাদের) দায়িত্ব শুধু (বিধি-বিধান) পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া। ('পরিষ্কারভাবে' এর অর্থ এই যে, দাবী স্পষ্ট এবং প্রমাণ বিশুদ্ধ হতে হবে। এমনিভাবে আপনার দায়িত্বেও এ কাজ ছিল, যা আপনি করছেন। যদি হঠকারিতাবশত দাবী ও প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করে, তবে আপনার কি দোষ!) এবং (তাদের ব্যবহার আপনার সাথে অর্থাৎ তর্ক করা যেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়, তেমনি আপনার ব্যবহার তাদের সাথে অর্থাৎ তওহীদ ও সত্য ধর্মের দিকে আহবান করা কোন নতুন ব্যাপার নয়। বরং এ শিক্ষাও প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। সেমতে) আমি প্রত্যেক উম্মতে (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে) কোন না কোন পয়গম্বর (এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য) প্রেরণ করেছি যে, তোমরা (বিশেষভাবে) আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান (এর পথ) থেকে (অর্থাৎ শিরক ও কুফর থেকে) বেঁচে থাক। (এতে কোন কোন বস্তুকে হারাম করাও এসে গেছে, যা মুশরিকরা নিজেদের মতে করত। কেননা, এটা শিরক ও কুফরের শাখা ছিল।) অতএব তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন (কারণ তারা সত্যকে কবুল করেছে) এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে।

(উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও পয়গম্বরগণের মধ্যে এ ব্যবহার এমনিভাবে চলে আসছে এবং পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টকরণ সম্পর্কিত আল্লাহ্র ব্যবহারও চিরকাল থেকে এমনি অব্যাহত রয়েছে। কাফিরদের তর্কবিতর্কও প্রাচীন, পয়গম্বরগণের শিক্ষাও প্রাচীন এবং সবার সৎপথ না পাওয়াও প্রাচীন। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন কেন? এ পর্যন্ত সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। এতে সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়ে তাদের সন্দেহের জওয়াবও সংক্ষেপে হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরূপ কথাবার্তা বলা পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতে এর সমর্থন ও জওয়াবের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের সাথে তর্ক করা যে পথভ্রষ্টতা,

তা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর (ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে) দেখ যে, (পয়গম্বরগণের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদের কেমন (শোচনীয়) পরিণাম হয়েছে। (অতএব এ তারা যদি বিপথগামী না হত, তবে আযাবে কেন পতিত হল? এগুলোকে আকস্মিক ঘটনা বলা যায় না। কারণ, এগুলো অভ্যাসের বিপরীতে হয়েছে, পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী, পরে হয়েছে এবং ঈমানদাররা এগুলো থেকে মুক্ত রয়েছে। এরপরও এটা যে আযাব, এতে সন্দেহ থাকতে পারে কি? উম্মতের কোন একজন বিপথগামী হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মাহত হতেন, তাই এরপর আবার তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, যেমন পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল, এমনিভাবে তারাও। অতএব) তাদের সৎপথে আনার বাসনা যদি আপনার থাকে, তবে (কোন লাভ নেই; কারণ) আল্লাহ্ হিদায়ত করেন না, যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) বিপথগামী করেন। (তবে সে হঠকারিতা ত্যাগ করলে হিদায়ত করে দেন। কিন্তু তারা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না। ফলে তাদের হিদায়তও হবে না।) এবং (বিপথগামিতা ও আযাব সম্পর্কে যদি তাদের এরূপ ধারণা থাকে যে, তাদের উপাস্যরা এ অবস্থায়ও আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে তারা বোঝে নিক যে, আল্লাহ্‌র মুকাবিলায়) তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (এ পর্যন্ত তাদের প্রথম সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) তারা খুব জোরেশোরে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যে ব্যক্তি মরে যায়, আল্লাহ্ তাকে পুনর্বার জীবিত করবেন না (এবং কিয়ামত আসবে না। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) কেন জীবিত করবেন না? (অর্থাৎ অবশ্যই জীবিত করবেন।) এ ওয়াদাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে রেখেছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক (বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (পুনর্বার জীবিত করার কারণ) যাতে (ধর্ম সম্পর্কে) যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ করত (এবং পয়গম্বরদের ফয়সালা শুনে পথে আসত না) তাদের সামনে তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ চাক্ষুস) প্রকাশ করে দেন এবং যাতে (এ স্বরূপ প্রকাশের সময়) কাফিররা (পুরোপুরি) জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (এবং পয়গম্বর ও মু'মিনরা সত্যবাদী ছিল। অতএব কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং আযাব দ্বারা ফয়সালা হওয়া জরুরী এ হচ্ছে لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ বাক্যের জওয়াব। তারা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করত, এর কারণ ছিল এই যে, তাদের ধারণায় মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কারও সাধ্যে ছিল না। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি প্রমাণ করে এ সন্দেহের জওয়াব দিচ্ছেন যে, আমার শক্তি এত বিরাট যে,) আমি যে বস্তু (সৃষ্টি করতে) চাই; (তাতে আমার কোনরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।) তাকে আমার পক্ষ থেকে শুধু এতটুকুই বলা (যথেষ্ট) হয় যে, তুমি (সৃষ্ট) হয়ে যাও, ব্যস তা (অস্তিত্বে) হয়ে যায়। (সুতরাং এমন অপার শক্তির সামনে প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করা মোটেই কঠিন নয়, যেমন প্রথমবার তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এখন উভয় সন্দেহের পূর্ণ জওয়াব হয়ে গেছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন?

এ সন্দেহ যে অসার; তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফিরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহ্র কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন---একটি বোকামি ও হঠকারিতাপ্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

উপমহাদেশেও আল্লাহ্র কোন রসূল আগমন করেছেন কি? ঃ لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ---এবং আরও একটি আয়াত اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপর পক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ ---আয়াত থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন রসূল আগমন করেন নি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর কোন পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই কোরআন পাকে তাদেরকে اُمِّيُّوْنَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেন নি।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(৪১) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানত। (৪২) যার দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্‌র জন্য স্বদেশ (মক্কা) ত্যাগ করেছে (এবং আবিসিনিয়ায় চলে গেছে) তাদের উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) নির্যাতন হওয়ার পর (কারণ এমন অপারক অবস্থায় দেশ ত্যাগ করা খুবই মনোকষ্টের কারণ হয়) আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব। (অর্থাৎ তাদেরকে মদীনায় পৌঁছিয়ে খুব শান্তি ও সুখ দেব। সেমতে কিছুদিন পরেই আল্লাহ্ তা'আলা তারেদকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং একেই আসল দেশ করে দেন। তাই একে আবাস বলা হয়েছে। তারা সেখানে সর্ব প্রকার উন্নতি লাভ করেন। তাই একে حَسَنَةً তথা উত্তম বলা হয়েছে। আবিসিনিয়ায় তাদের অবস্থান ছিল সাময়িক। তাই একে আবাস বলা হয়নি) এবং পরকালের পুরস্কার (এর চাইতে) অনেক গুণে বড় (কারণ, যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী)। আফসোস! যদি (পরকালের এই প্রতিদান) তারা (অর্থাৎ অন্য কাফিররা) জানত! (এবং তা অর্জন করার আগ্রহে মুসলমান হয়ে যেত!) তারা (অর্থাৎ হিজরতকারীরা এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এজন্য যে, তারা) এমন, যারা (অপ্রিয় ঘটনাবলীতে) সবর করে। (সেমতে দেশ ত্যাগ করা যদিও তাদের কাছে অপ্রিয়, কিন্তু এছাড়া ধর্মপালন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্মের খাতিরে তারা দেশ ছেড়েছে এবং সবর করেছে।) এবং (তারা সর্বাবস্থায়) পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (দেশ ত্যাগ করার সময় চিন্তা করে না যে, খাওয়া-দাওয়া করবে কোত্থেকে?)

জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা : اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا—এটি هِجْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহ্‌র জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড়

ইবাদত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الهجرة تهدم ما كان قبلها ---অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا-এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি? ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। 'দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা' এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয্যত ও গৌরব পাওয়া---সবই এর অন্তর্ভুক্ত।---(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযূল মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কিরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তীকালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কিরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা মদীনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্যলাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ্ তা'আলা অসামান্য ইয্যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তফসীরে বাহ্রে মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন ঃ

والذين هاجروا عام فى المهاجرين كانوا فيشمل اولهم

اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا واخرهم অর্থাৎ আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।